

সংযম ও আত্মশুদ্ধিতে

রমজানের সগুণা

মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	১৩
শবেবরাত	
শবেবরাতে কী হয়	১৪
শবেবরাত সম্পর্কীয় আহকাম ও মাসায়েল	১৫
শবেবরাতে প্রচলিত বিদআতসমূহ	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	২১
রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি : পথ ও পাথেয়	
রমজান পর্যন্ত হায়াতের দুআ	২১
রমজানের প্রস্তুতি	২৩
রমজানের গুরুত্ব ও ফজিলত	২৯
রমজান, সাওম-সিয়াম ও রোজার অর্থ	২৯
রোজার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া	২৯
তাকওয়ার পরিচয়	৩১
তাকওয়া ও রোজার ফায়দা	৩১
রোজার ফজিলত, মাহাত্ম্য ও সওয়াব সম্পর্কে	৩৬
হাশরের মাঠে রোজা ও কুরআনের সুপারিশ	৩৬
রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দেবেন	৩৭
আল্লাহ তায়ালা রোজাদারদের পানি পান করাবেন	৩৯
রোজা জান্নাত লাভের পথ	৩৯
রোজাদারের দুআ কবুল হয়	৩৯
পেছনের সকল গুনাহ মাফ	৪০
উম্মতে মুহাম্মাদির বিশেষ বৈশিষ্ট্য	৪০
রমজানে যারা বদদুআ পায়	৪১
হাদিসে নববিতে রমজানের সারগর্ভ	৪১
আপনি কীভাবে রমজান কাটাবেন	৪৩
আকাবিরদের রমজান	৪৩

বুজুর্গির মাপকাঠি	৪৩
নবিজির উৎসাহ প্রদান	৪৩
রমজান মাসে নবিজির দৈনিক আমল	৪৪
আমরা কীভাবে রমজান কাটাব	৪৪
একটি সুন্দর রমজান কাটানোর জন্য করণীয়	৪৫
রমজান ও খতমে কুরআন	৫৫
রমজান ও কুরআন	৫৫
রমজানে সব ইবাদতের সওয়াব বেশি	৫৯
রমজানে সালাফদের তিলাওয়াত	৬০
খতমে কুরআনের নির্দিষ্ট দুআ পড়া	৬১
রমজানের মাসায়েল	৬২
চাঁদ দেখাসংক্রান্ত মাসয়ালা	৬২
নতুন চাঁদ দেখার দুআ	৬২
রোজার নিয়ত	৬৩
সেহরি	৬৪
ইফতার	৬৫
ইফতারের দুআ	৬৬
মেজবানের ঘরে ইফতারের পর দুআ	৬৬
কাফফারা	৬৬
যেসব কারণে রোজা কাজা ও কাফফারা উভয়টি জরুরি	৬৭
কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি	৬৮
রোজা ভঙ্গের কারণসমূহ	৬৯
যেসব কারণে রোজা ভাঙে না, ক্ষতিও হয় না	৭০
যেসব কারণে রোজা মাকরুহ হয়	৭২
যেসব কাজ রোজাদারের জন্য মাকরুহ নয়	৭৪
রোজার কিছু আধুনা মাসায়েল	৭৪
স্থান পরিবর্তনে রোজার ব্যাপ্তি পরিবর্তন ও করণীয়	৭৬
মহিলাদের হায়েজ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ	৭৭
রমজানে মেডিকেল টেস্ট ও ওষুধ ব্যবহার	৭৭
যাদের জন্য রোজা না রাখার অনুমতি আছে	৭৮
ফিদিয়া	৮০

শাওয়াল মাসের রোজা	৮১
তৃতীয় অধ্যায়	
তারাবির নামাজ ও খতমে কুরআন	৮২
তারাবির নামাজের হুকুম ও ফজিলত	৮২
‘তারাবি’ বলে নামকরণের কারণ	৮৪
তারাবির নামাজের রাকাত সংখ্যা	৮৫
২০ রাকাতের দলিল	৮৬
চার মাজহাবের ইমামের অভিমত	৮৮
বিবাদের চেয়ে আমল উত্তম	৯২
তারাবির নামাজে দুই বা চার রাকাত পর নির্দিষ্ট দুআ পড়া	৯৬
তারাবি নামাজে তাড়াহুড়া অনুচিত	৯৭
খতমে কুরআনের নির্দিষ্ট দুআ	৯৮
তারাবির মাসায়েল	৯৮
চতুর্থ অধ্যায়	
ইতেকাফ : ফাজায়েল ও মাসায়েল	১০১
ইতেকাফ কাকে বলে	১০২
ইতেকাফের ফজিলত	১০২
কেন করব ইতেকাফ	১০৪
ইতেকাফে পালনীয় আমলসমূহ	১১০
পরিহার্য কাজসমূহ	১১২
শেষ দশকে লক্ষণীয় দশ	১১৪
ইতেকাফের স্থান	১১৬
ইতেকাফের আদব	১১৭
ইতেকাফের প্রকারভেদ	১১৭
ইতেকাফের রুকন	১১৭
মসজিদের সীমানা বলতে কী বোঝায়	১১৭
কী কী কারণে বের হওয়া জায়েজ	১১৮
ইতেকাফ ভাঙার কারণ	১১৯
কখন ইতেকাফ ভাঙা জায়েজ	১১৯
ইতেকাফ ভেঙে গেলে করণীয়	১১৯
মহিলাদের ইতেকাফ	১২০

পঞ্চম অধ্যায়	
লাইলাতুল কদর বা লাইলাতুল কদর	১২১
লাইলাতুল কদর শুধু উম্মতে মুহাম্মাদিকে দেওয়া হয়েছে	১২১
লাইলাতুল কদর শুধু উম্মতে মুহাম্মাদিকে দেওয়ার কারণ	১২১
লাইলাতুল কদরের ফজিলত	১২২
লাইলাতুল কদরে ফেরেশতাদের অবতরণ	১২৩
হাজার মাসের চেয়ে উত্তম	১২৩
মাগফিরাতে লাইলাতুল কদর	১২৪
লাইলাতুল কদরের ইবাদত থেকে বঞ্চিতরা বড়োই হতভাগ্য	১২৬
লাইলাতুল কদরে কীভাবে রাত জাগবে	১২৭
লাইলাতুল কদরের দুআ	১২৭
লাইলাতুল কদরে সারা রাত জাগা জরুরি নয়	১২৭
লাইলাতুল কদর গোপন রাখার রহস্য	১২৯
অন্য অনেক বস্তুর মতোই গোপন	১৩০
সমাজে প্রচলিত লাইলাতুল কদরের কিছু রুসম ও বিদআত	১৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়	
জাকাতের গুরুত্ব ও মাসায়েল	১৩২
যাদের ওপর জাকাত ফরজ	১৩৫
যেসব জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ হয়	১৩৫
নিসাবের বিবরণ	১৩৬
অলংকারের জাকাত	১৩৭
স্বামী-স্ত্রীর জাকাতের হিসাব ভিন্ন ভিন্ন	১৩৭
যেসব জিনিসের ওপর জাকাত ফরজ নয়	১৩৮
ঋণ ও পাওনা প্রসঙ্গ	১৩৮
কীভাবে জাকাত দিতে হবে	১৪০
জাকাত আদায়ে নিয়ত ও প্রাসঙ্গিক বিষয়	১৪১
শেয়ারবাজারের ক্ষেত্রে করণীয়	১৪৩
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট	১৪৪
ব্যাংক গ্যারান্টি মানি	১৪৪
ব্যাংক লোন	১৪৪
বায়নানামার টাকা	১৪৫

ব্যবসায়িক পণ্যের কোন মূল্য ধর্তব্য	১৪৫
বিক্রিত পণ্যের বকেয়া টাকার জাকাত	১৪৫
জাকাত ব্যয়ের খাত	১৪৬
যেসব খাতে জাকাত ব্যয় করা যাবে না	১৪৭
যেসব আত্মীয়দের জাকাত দেওয়া বৈধ নয়	১৪৮
ঋণকে জাকাত বাবদ কর্তন করা	১৪৮
কর্মসংস্থানে জাকাত	১৪৮
চিকিৎসায় জাকাত	১৪৯
জাকাত ট্যাক্স নয়	১৪৯
জাকাত থেকে বাঁচার অপকৌশল	১৪৯
ফিতরা : ফাজায়েল ও মাসায়েল	১৫০
ফিতরা কার ওপর ওয়াজিব	১৫০
রোজার পূর্ণতা অর্জনে ফিতরা	১৫০
ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার দুটি যুক্তি	১৫১
ফিতরা উপাদান ও পরিমাণ	১৫২
ফিতরার উত্তম উপাদান	১৫২
ফিতরার মাসায়েল	১৫৩
সপ্তম অধ্যায়	১৫৪
দুই ঈদ : করণীয় ও বর্জনীয়	
ঈদের রাতের ফজিলত ও গুরুত্ব	১৫৪
ঈদের রাতের ইবাদত	১৫৬
ঈদের রাতসমূহের অবমূল্যায়ন	১৫৬
ঈদুল ফিতর দিনের সুন্নাতসমূহ	১৫৮
ঈদে আনন্দের নামে সীমালঙ্ঘন	১৫৯
পর্দাহীনতা, বেহায়াপনা ও গানবাদ্য	১৬০
অষ্টম অধ্যায়	১৬১
নফল নামাজসমূহ	
নফল নামাজের গুরুত্ব	১৬১
কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ	১৬২
কিয়ামুল লাইল সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস	১৬৩
তাহিয়্যাতুল অজু	১৬৮

তাহিয়াতুল মসজিদ	১৬৮
ইশরাক	১৬৯
চাশত	১৭০
দোহা আর ইশরাক কি এক নামাজ	১৭১
আওয়াবিন	১৭১
তওবার নামাজ	১৭২
সালাতুল হাজত	১৭২
ইস্তেখারার নামাজ	১৭৩
ইস্তেখারার দুআ	১৭৪
সালাতুত-তাসবিহ	১৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি : পথ ও পাথেয়

হিজরি বর্ষপঞ্জিকায় ১২টি চন্দ্রমাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস রমজান। এটা মুমিনদের জন্য বরকতময় ইবাদতের মৌসুম। আল্লাহর নৈকট্যলাভের এক উত্তম সময়।

কৃষকদের কাছে ফসল কাটার মৌসুম সবচেয়ে আনন্দের। সারাটি বছর সে এ সময়ের জন্য সশ্রম অপেক্ষা করে। তদ্রূপ একজন মুমিনের কাছে রমজান হলো ফসলের ভরা মৌসুম। সাধারণ সময়ের তুলনায় রমজানে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

রহমত, বরকত, ক্ষমা-মাগফিরাত, সবর, শোকর ও ইবাদতের বার্তা নিয়ে রমজান আসে আমাদের দোরগোড়ায়। রমজানের রোজা ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের অন্যতম একটি, যাকে মুমিনদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। রমজান আসে মাগফিরাতের দ্বার উন্মোচিত করতে। রমজান আসে পাপ-পঙ্কিলতা দূর করে মুমিন জীবনকে বিশুদ্ধ ও সুশোভিত করার তরে। জাহান্নামিদের মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশের বার্তা দেওয়ার জন্য রমজানের আগমন। কোনো কাজের প্রস্তুতি ছাড়া ভালোভাবে তা সম্পন্ন করা যায় না। তাই রমজান আসার আগেই আমাদের পথ ও পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত।

রমজান পর্যন্ত হায়াতের দুআ

রমজানের এত গুরুত্ব থাকার কারণে এর প্রস্তুতি নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। প্রস্তুতি ছাড়া কোনো কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন হয় না। ‘শাবান’ মাসকে বলা হয় রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের মাস। রমজানের পরে শাবান মাসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই, পৃথিবীতে বৃষ্টি হওয়ার আগে একটা ঠান্ডা বাতাস বইতে থাকে। এই বাতাসটা হলো রহমতের বৃষ্টির আগমনি বার্তা। সাথে সাথে যেন ঘোষণা করে যায়— আসছে সেই বৃষ্টি, যার প্রতীক্ষা করছিল মানুষ। তেমনি রমজান হলো সেই মাস, যার জন্য প্রতীক্ষা করে মুত্তাকি বান্দাগণ। রমজানের দুই মাস আগে থেকেই রাসূল (সা.) দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ، وَشَعْبَانَ، وَيَكُونَنَّ مَضَانٌ۔

‘হে আল্লাহ! আমাদের রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করো এবং রমজানে আমাদের পৌছাও।’

অনেক সালাফ তো ছয় মাস আগে থেকেই দুআ শুরু করতেন। বিশিষ্ট তাবেয়ি মুআল্লা ইবনে ফজল (রহ.) বলেন—‘তাবেয়িগণ রমজানের ছয় মাস আগ থেকেই দুআ করতেন, আল্লাহ যেন তাঁদের রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এরপর রমজান মাস চলে গেলে পরের ছয় মাস দুআ করতেন, যেন রোজা কবুল করে নেন।’^১

অনেক তাবেয়ি এভাবেও দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ قَدْ أَظْلَمْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَحَضَرَ فَسَلِّمْهُ لَنَا وَسَلِّمْ نَالَهُ، وَارْزُقْنَا صِيَامَهُ وَقِيَامَهُ، وَارْزُقْنَا فِيهِ الْجِدَّ وَالْاجْتِهَادَ وَالنَّشَاطَ، وَأَعِزَّنَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ-

হে আল্লাহ! আমাদেরকে রমজানে উপনীত করুন। তাকে আমাদের কাছে উপস্থিত করুন এবং আমাদেরকে উপস্থিত করুন তার মাঝে। তাতে রোজা রাখার, কিয়ামুল লাইলের এবং একাত্ততা, পরিশ্রম ও উদ্যমের সাথে ইবাদাতে আত্মনিয়োগের তাওফিক দিন। আর তাতে আমাদেরকে সব ধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।

আবার ইচ্ছে করলে এ দুআও পড়া যায়—

اللَّهُمَّ سَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَسَلِّمْ لِي رَمَضَانَ وَتَسَلِّمْهُ مِنِّي مُتَقَبِّلًا-

হে আল্লাহ! আমাকে রমজানে পৌঁছে দিন এবং রমজানকে আমার কাছে উপনীত করুন। আর তার (রোজা ও কিয়াম)কে আমার পক্ষ থেকে কবুল করুন।^২

নেক হায়াতের দুআ সব সময়ই করা যায়। বিশেষত রমজানের ছয় মাস অন্তত দুই মাস আগে বারবার এ দুআ করা যেতে পারে। কারণ, রমজান হলো অব্যাহত রহম ও ক্ষমার মাস। বিশেষত আল্লাহর দরবারে এই আরজু পেশ করা—আপনার রহমতে এতদিন বাঁচলাম আর দুটো মাস বাঁচলে তো রমজান পেয়ে সৌভাগ্যবান হতে পারি।

রমজানের প্রস্তুতি

রমজানের আত্মশুদ্ধিমূলক প্রস্তুতি দুই রকমের হয়—শারীরিক ও মানসিক। কেননা, রোজা এমন একটি ইবাদত—যার জন্য শারীরিক ত্যাগ ও মানসিক দৃঢ়তা তথা ঈমানি মনোবল প্রয়োজন। শারীরিক কোনো সমস্যা থাকার দরুন ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে রমজানের আগেই তা করা উচিত। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কোনো ঝামেলা থাকলে রমজানের আগেই তা সমাধান করে নেওয়া জরুরি। যাতে একনিষ্ঠচিত্তে নিজেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে সঁপে দেওয়া যায়। সমস্যাগুলো সমাধান না হলে তো কেবল ফরজ রোজা রাখাই মুশকিল; নফল ইবাদত করা আরও কষ্টকর। অনেকে রমজানের অর্ধেক সময় কেবল কেনাকাটা

^১ (শুআবুল ইম্যান : ৩৫৩৪; মুসনাদে আহমাদ : ২৩৪৬) ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) রচিত : লাভায়েফুল মাআরেফ, খ.-১, পৃ.-১৪৮

^২ موارد الظمان لدروس الزمان. خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وأداب وأخلاق حسان. খন্ড-১, পৃ. ৩৩৮

করেই কাটিয়ে দেয়। ফলে ইবাদত করার সময় পায় না। সুতরাং যাবতীয় ঝামেলা রমজানের আগেই শেষ করা উচিত। এটাই রমজানের মূল প্রস্তুতি। রমজানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাস জীবনে কয়বায় পাবে মানুষ!

রমজানকে স্বাগত জানানোর জন্য মিছিল ও র্যালি করার প্রচলন শুরু হয়েছে। এভাবে স্বাগত জানানোর মধ্যে বিশেষ কোনো ফজিলত নেই; বরং পুণ্য কাজের প্রস্তুতির মাধ্যমে স্বাগত জানাতে হবে। সারা বছরের সাধারণ রুটিনের চেয়ে রমজানের রুটিন একটু ভিন্ন হওয়া চাই। সাধারণত অন্যান্য মাসে দুনিয়াবি কাজের ব্যস্ততা থাকে বেশি। তাই রমজানের রুটিনে ইবাদতের জন্য একটু বেশি সময় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এটাই প্রকৃত প্রস্তুতি ও স্বাগত জানানোর পদ্ধতি।

শুধু সালফে সালেহিন নয়; বরং নিকট অতীতের বুজুর্গদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই—বৃদ্ধ বয়সেও তাঁরা যেভাবে রমজান কাটিয়েছেন, যেভাবে ইবাদত করেছেন, তা অনন্য অতুলনীয়।

একটি সুন্দর রমজান আমাদের কাম্য, আমাদের পরম আরাধ্য। আমরা চাই সুন্দর একটি রমজান কাটাতে। দুনিয়া তো দারুল আসবাব। উপকরণ দিয়ে সবকিছু হয়। আর মানুষের মনও ধাবিত হয় উপকরণের প্রতি। যথেষ্ট উপকরণ থাকলে হৃদয় থাকে শান্ত ও দৃষ্টিভ্রামুক্ত। তাই আসুন আমরা রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সেজন্য আমরা এ কাজগুলো করতে পারি—

যাবতীয় কেনাকাটা করে রাখা : আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ কেনাকাটা করতে অনেক সময় ব্যয় হয়। আমরা সাধারণত দুই ধরনের কেনাকাটা করি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। যেমন : তেল, চাল, ডাল ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যাদি আগেই মজুদ করে নিতে পারি। একত্রে অন্তত এক মাস বা ১৫ দিনের সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মাছ-গোশত কিনে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা যায়। অফিসে বা দোকানপাটে যাওয়া-আসার সময় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে নিয়ে আসতে পারি। খেয়াল রাখব, যেন কোনোভাবেই সময় নষ্ট না হয়।

আরেক ধরনের কেনাকাটা হলো—পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বস্তু যেমন : জুয়েলারি, প্রসাধনী, কসমেটিকস, শো-পিসসহ যাবতীয় গৃহ শোভাবর্ধনকারী সৌখিন জিনিসপত্র। আমরা পারিবারিক মিটিং করে সবার মতামতের ভিত্তিতে সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিতে পারি। এর ফলে কাজগুলো হবে অনেক গোছালো ও পরিপাটি। পারিবারিক সদস্যের চাহিদা, গরিব প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য একটা চাহিদা ফর্দ তৈরি করে নিতে পারি। তারপর সাশ্রয়ে পাওয়া যায়, এমন শপিংমল থেকে কেনাকাটা করতে পারি। টেইলার্সে বানানোর মতো হলে আগেই অর্ডার দিয়ে রাখা ভালো। অনেকেই রমজান শুরু হওয়ার আগে কেনাকাটা করে। এর ফলে সে এক চিন্তামুক্ত ও ইবাদত উপযোগী রমজান উপভোগ করতে পারে।

গরিবদের জন্যও বরাদ্দ : রমজান মাসে প্রায় সবার বাড়িতেই মেহমানদারির আয়োজন করা হয়। আমরা অনেকেই সওয়াবের আশায় মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লিদের দাওয়াত দিই। তবে মনে রাখতে হবে, এভাবে বিশাল একটি অনুষ্ঠান করে খাওয়ানোর চেয়ে উত্তম পছন্দ রয়েছে।

আর তা হলো— গরিব মানুষের ঘরে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-আশাক পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে প্রকৃত হকদারগণ পাবে এবং তাদের মুখেও ফুটে উঠবে আনন্দের আভা। অধিকাংশ সময় আমরা এমন লোকদের দাওয়াত করে খাওয়াই, যাদের ঘরে খাবারের অভাব নেই। কিন্তু আমাদের সমাজের এমন অনেক পরিবার আছে—যারা সামান্য সেহরি-ইফতার দিয়ে রোজা পালন করে। আমার-আপনার দস্তুরখানে বাহারি খাবার—মাছ-মাংস, ফলমূল, দুধ-কলা ইত্যাদি থাকে। আমরা কি পারি না সামর্থ্যানুযায়ী কয়েকজন গরিব মানুষের আনন্দের কারণ হতে? জায়েদ ইবনে জুহানি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করালো, তারও রোজাদারের ন্যায় সওয়াব হবে; তবে রোজাদারের সওয়াব বা নেকি বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।’^৩

হাদিসে এসেছে, কোনো রোজাদারকে ইফতার করালে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব আলাহ তায়াল্লা তাকে দান করেন। এখানে ইফতার করানো মানে আপনার সাথে বসে ইফতার করাতে হবে এমনটি নয়; বরং কেনাকাটা করে অথবা নগদ টাকা দেওয়া যেতে পারে।

জাকাতের হিসাব ও প্রস্তুতি : মুমিনদের জন্য প্রতি এক বছর পরপর জাকাত প্রদান করা ফরজ হয়েছে। এটি ইসলামের মূল স্তম্ভের একটি। জাকাতের বিধান হলো—পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করে শতকরা ২.৫০ হারে জাকাত প্রদান করা। সম্পত্তি কোথায় আছে, কার কাছে আছে, কত টাকা ঋণ আছে, কত টাকা বাদ দিয়ে জাকাতের হিসাব করতে হবে ইত্যাদি। একটু সময় সাপেক্ষ বিষয়। ঝামেলা মনে হলে বিজ্ঞ কোনো আলিমের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে। পরামর্শ করার ফলে কাজটি অনেক সহজ মনে হবে। তারপর খাতসমূহ নির্ধারণের মাধ্যমে তালিকাবদ্ধ করে রমজান এলে নির্দিষ্ট হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।

নগদ টাকা ও মূল্যবান যেকোনো জিনিস জাকাত হিসেবে দেওয়া যায়; খাদ্যদ্রব্য বা কাপড়-চোপড়ও হতে পারে জাকাতের উপাদান। গরিব-ইয়াতিম ছাত্রদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী-স্বরূপ বইপত্র, ল্যাপটপ বা কম্পিউটার কিনে দেওয়া যেতে পারে। এসব উপাদান জাকাত প্রদান করলে যথেষ্ট সময় দরকার। তাই এ ধরনের কাজগুলো রমজান আসার আগেই করে ফেলা উচিত।

অন্যান্য কাজ আগেই সম্পন্ন করা : মানুষের চাহিদা যেহেতু ভিন্ন, তাই সমস্যাগুলোও বৈচিত্র্যময়। ঋণ মেটানো, সাংসারিক ও পারিবারিক ঝামেলা মেটানো, অফিসিয়াল কাজ সমাধান, কারও বাড়িতে যাওয়ার প্রয়োজন ইত্যাদি যথাসম্ভব রমজান মাস আসার আগেই সেরে ফেলা উচিত।

তারাবির মসজিদ/স্থান নির্ধারণ : তারাবির নামাজ রমজান মাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। তাই আমাদের উচিত তারাবি নামাজের স্থান আগেই নির্ধারণ করা। বড়ো ধরনের কোনো সমস্যা না থাকলে অবশ্যই খতম তারাবি পড়ব। যেসব মসজিদে খুব দ্রুতগতিতে

^৩ তিরমিজি, ইবনে মাজাহ, নাসায়ি

তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে না যাওয়াই উত্তম। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নবিজিকে তারতিলের সাথে অর্থাৎ যথাযথভাবে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً-

‘কুরআন তিলাওয়াত করো তারতিলের সাথে (ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে)।’

যেসব মসজিদে ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করা হয়, সেখানে যাওয়াই উত্তম। এখন তো আরামের জন্য আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ খুঁজি।

তারাটিকে আজকাল আমরা তাড়াহুড়োর নামাজ বানিয়ে ফেলেছি। সম্ভব হলে মসজিদে যেন তারাটি আস্তে আস্তে তারতিলের সাথে পড়ে, এজন্য চেষ্টা করব। সম্ভব না হলে দূরে কোথাও চলে যাব, যেখানে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত হয়। আমাদের মধ্যে যারা মসজিদের দায়িত্বশীল আছে, তাদের উচিত সালাতুত তারাবির জন্য আগেভাগেই যোগ্য ইমাম ঠিক করা।

অনেক ব্যবসায়ী খতম মসজিদে যেতে পারেন না, তারা মার্কেটে বা কোনো বাসাবাড়িতে তারাটি পড়েন এবং তারা ১০/১৫ দিনে খতম করে বাকি দিন সূরা তারাটি পড়েন। কারণ, রমজানের শেষ দিকে প্রচণ্ড ব্যস্ততা থাকে তাদের। এটাও ভালো একটি পন্থা।

সময় পরিকল্পনা : সময়ের সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে সঠিকভাবে কিছুই করা যায় না। তাই আমরা রমজান শুরুর আগে সময়সূচি নির্ধারণ করে নেব। প্রয়োজনে সময়ের পরিকল্পনামতো রুটিন করে টানিয়ে রাখতে পারি।

প্রত্যেক মানুষের পেশা ও কর্মব্যস্ততা অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে হবে। কখন আপনি অফিসে যাবেন, দোকানে বসবেন, কখন বাসায় ফিরবেন, কখন তিলাওয়াত করবেন ইত্যাদি সব পরিকল্পনা করে রাখা চাই। রুটিনের মধ্যে পারতপক্ষে ঘুমানোর সময়টা একটু কমিয়ে রাখা উচিত। কারণ, এ মাসের প্রতিটি ইবাদতের সওয়াব অনেক বেশি; যে সওয়াব অন্য মাসে পাবেন না। পার্থিব কাজের পরিমাণ যতটা কমিয়ে আনা যায়, ততই ভালো। তবে পরিবারের হক আদায়ের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করার পরিকল্পনা : আমাদের প্রায় অনেকেরই কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ নয়। রমজান মাসে এ ধরনের গ্যাপগুলো পূরণ করা সহজ। অনেক মসজিদ ও মাদরাসায় বিশেষ কোর্স চালু হয়। মজুবগুলোতে বয়স্কদের কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমও প্রায়শই চোখে পড়ে। যেখানে এ ধরনের কার্যক্রম চালু নেই, সেখানে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে স্থানীয় মসজিদ কমিটি ও পাড়া-মহল্লার তরুণদের।

রমজান মাসে দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া করা হয় না বলে ঘর-গৃহস্থালির কাজ অনেক কমে আসে। তাই যাদের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ নয়, তারা তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করার পরিকল্পনা করতে পারেন। কুরআন নাজিলের মাসে কুরআন বিশুদ্ধ করার চেষ্টাও ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে।

তরজমা ও তাফসির পড়ার পরিকল্পনা : আমাদের মধ্যে যাদের কুরআন তিলাওয়াত বিশুদ্ধ, তাদের উচিত চেষ্টা করা কুরআনের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পড়ার। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনেক তরজমা-তাফসির রয়েছে। তরজমা ও তাফসির বাছাইয়ের জন্য অবশ্যই নির্ভরযোগ্য কোনো আলিমের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া উচিত। নিজে নিজে বাছাই করতে গেলে বিভ্রান্তির আশঙ্কাও আছে। এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজে পড়ু যাদের জন্য *মারেফুল কুরআন* সবচেয়ে ভালো। কেননা, এটা বুঝতে ততটা বেগ পেতে হয় না। সময় ও আগ্রহ থাকলে অন্যতম প্রসিদ্ধ *তাফসিরে ইবনে কাসির*ও পড়া যেতে পারে। আমরা কোন তরজমা বা তাফসির পড়ব, তা আগে থেকেই নির্ধারণ করে রাখা উচিত।

প্রতিদিন কাউকে ইফতার করানো : আগে আমরা বলেছি, রমজানের আগেই নিজের সাধ্যমতো গরিব মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। এটা তো অবশ্যই উত্তম। আরেকটা সওয়াবের কাজ হলো—আমরা ইফতারের সময় কোনো মেহমান বা কাউকে আপনার ইফতারের অংশীদার বানাতে পারি। কেননা, রোজাদারকে ইফতার করালে রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়। এটা নিঃসন্দেহে অব্যাহত সুযোগ। তাই অন্তত একজনকে হলেও সাথে নিয়ে ইফতার করার চেষ্টা করব। আরও বেশি সামর্থ্য থাকলে আরও বেশি লোকজনকে ইফতার করানো উচিত। অথবা ইফতার বানিয়ে কারও বাসায় পাঠিয়ে দিলেও সমপরিমাণ সওয়াব হাসিল হবে। এ কাজের জন্য অসহায়, গরিব, মুসাফির, আলিম, আত্মীয়স্বজন ও পড়শিদের মধ্য থেকে যে কাউকেই বেছে নেওয়া যেতে পারে। তবে মুত্তাকি ও দ্বীনদারদের প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করবে।

বাসায় মহিলাদের সহযোগিতা করা : রমজানে মহিলাদের রান্নাবান্নার ব্যস্ততা থাকে বেশি। সেহরি ও ইফতার তৈরি করার কাজে তাদের সহযোগিতা করা উচিত। কেননা, এ মাসে আমরা সাধারণত একটু স্পেশালি খাবারের আয়োজন করে থাকি। তাই নারীদের রান্নার কাজে সহযোগিতা করলে তারা অল্প সময়ে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করতে পারবে। এর ফলে তারাও হতে পারবে ইবাদতে একটু বেশি মশগুল।

বিশেষ ফজিলতপূর্ণ ইতেকাফে গুরুত্বারোপ : রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করার বিরাট ফজিলত রয়েছে। ইতেকাফে বসতে হলে এখন থেকেই আপনাকে সবকিছু গোছাতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে। নইলে ঝামেলায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নিজ এলাকার মসজিদে ইতেকাফ করা উচিত। তবে নিজের শাইখ বা কোনো আলিমের সহবত নেওয়ার জন্য দূরে ইতেকাফ করতে হলেও সমস্যা নেই। ইতেকাফ সম্পর্কে আমাদের মাঝে চরম উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। এ রকম উদাসীনতা কাটিয়ে ইতেকাফের প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত।

গুনাহ ও বদভ্যাস পরিত্যাগ : ভাই! রমজান চলে আসছে, এখনও আপনি গুনাহে লিপ্ত? আগে যা করেছেন, এখনও তা করে যাচ্ছেন? এখন রমজানের ওসিলায় সেগুলো বন্ধ করুন। আগে সিগারেট খেতেন, এখন পরিত্যাগ করুন। নৈতিকতা ধ্বংস করে—এমন নাটক-মুভি দেখতেন,

তা ছেড়ে দিন। নিজেকে বোঝান—এটাই হতে পারে আমার জীবনের শেষ রমজান। গুনাহ ও বদ বদভ্যাসগুলো রমজানের ওসিলায় ছাড়তে পারলে দেখবেন, সারাজীবনের জন্য এগুলো ত্যাগ করা হয়ে গেছে।

সুনির্দিষ্ট গুনাহ ছাড়ার পরিকল্পনা : প্রতি রমজানে আপনি এক/দুটি সুনির্দিষ্ট গুনাহ ছাড়ার দৃঢ় সংকল্প করুন। যেমন : আপনি দাড়ি কাটেন। এবার পরিকল্পনা করুন, আমি রমজান উপলক্ষ্যে দাড়ি কাটা বন্ধ করব। আপনি টাখনুর নিচে প্যান্ট পরেন। নিয়ত করুন, আর টাখনুর নিচে পরবেন না। মুখ দিয়ে ফাহেসা কথা বের হয় হরদম কিংবা আপনার রাগ অত্যধিক, কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। সেক্ষেত্রে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রমজান একটা উত্তম সময়। কারণ, একমাত্র রমজানেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেওয়া সম্ভব হয়।

পরিবারকে নিয়ে পরিকল্পনা : আপনি নিজে রমজান কীভাবে কাটাবেন, এটার পরিকল্পনা ও রুটিন করলেন; কিন্তু আপনার পরিবারের লোকদের কোনো রুটিন নেই। এমনটা উচিত না। পরিবারের কর্তা হিসেবে আপনার দায়িত্ব সবাইকে দ্বীনের পথে রাখা। আপনার ছেলেমেয়েদেরও রুটিন করে দিন। পরিকল্পনা দিন। সবাইকে একসাথে নিয়ে বসুন। বাচ্চাদের কাছ থেকে ওয়াদা নিন—প্রতিদিন কে কতটুকু কুরআন পড়বে, কে কী আমল করবে? সবাইকে উদ্বুদ্ধ করুন, পুরস্কার ঘোষণা করুন। বাচ্চাদের অনেক আবদার থাকে, আপনি বলে দিন—তুমি এ রমজানে এতবার কুরআন খতম করতে পারলে তোমাকে এটা দেবো। মোটকথা শুধু নিজের রুটিন ও পরিকল্পনা নয়; বরং পরিবারের সবার প্রতিই খেয়াল রাখা উচিত।

১৫. তওবা : সবচেয়ে বড়ো প্রস্তুতি হলো তওবা। আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে অতীতের সকল গুনাহ স্মরণ করে নিজেকে অপরাধী হিসেবে পেশ করা। আত্মসমালোচনা করে নিজের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। পূর্বে কৃত গুনাহ থেকে ফিরে আসার ওয়াদা করা। আমরা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে সুন্দরভাবে একটি রমজান কাটানোর তাওফিক কামনা করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা তওবা কবুলের জন্য মুখিয়ে থাকেন।

রমজানের গুরুত্ব ও ফজিলত

রমজান, সাওম-সিয়াম বা রোজার অর্থ

রমজান হলো হিজরি বর্ষের একটি মাসের নাম। এ মাসে পালিত বিশেষ ইবাদতের আরবি নাম সাওম। উপমহাদেশে এই ইবাদত বোঝাতে রোজা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। রোজা মূলত ফারসি ভাষার শব্দ।

আরবি শব্দ রমজান-এর শাব্দিক অর্থ হলো—জ্বালিয়ে দেওয়া, ঝলসে দেওয়া। মূলত আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় এ মাসে বান্দার সব গুনাহ জ্বালিয়ে দেন তথা ক্ষমা করে দেন। এ কারণেই এর নাম রমজান।

আর সাওম ও সিয়ামের আভিধানিক অর্থ হলো ‘বিরত থাকা’। পরিভাষায়—

هُوَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ إِلَى الْغُرُوبِ بِنِيَّةٍ مِنْ أَهْلِهِ-

‘ইবাদতের নিয়তে শরিয়তের আদিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকার নাম সাওম বা রোজা।’^৪

রোজা রেখে মিথ্যা বলা, পরনিন্দা করা, ঝগড়া-বিবাদ করা ইত্যাদি যেকোনো পাপাচারে লিপ্ত হলে যদিও রোজা আদায় হয়ে যাবে; কিন্তু রোজার পূর্ণতা আসবে না, উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এ কারণেই রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

‘কোনো ব্যক্তি যদি মিথ্যা কথা বলা এবং তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে, তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করা আল্লাহ তায়ালা কোনো প্রয়োজন নেই।’^৫

রোজার মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ-

‘হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো, যেমনভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর—যাতে করে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।’^৬

^৪ আল-বাহরুর রায়েক : খ.-২, পৃ.-২৭৮

^৫ বুখারি : ১৮০৪

^৬ সূরা বাকারা : ১৮৩

অতএব, স্পষ্টত অনুধাবন করা যাচ্ছে—তাকওয়া অর্জনের জন্যই রোজা ফরজ করা হয়েছে। তাই রোজা হলো মানুষকে তাকওয়াবান বান্দা হিসেবে গড়ে তোলার ট্রেনিং। আর এই তাকওয়াবানরাই হলো দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের হাতিয়ার। মাহে রমজান আসে হৃদয়ের কালিমা ও পক্ষিলতা দূর করে সাচ্চা তাকওয়াবান মুমিনে পরিণত করতে।

মধ্যযুগে যুদ্ধের ঘোড়া প্রশস্ত করা হতো এভাবে—কিছু ঘোড়াকে ছোটো থেকেই প্রচুর খাওয়াতো, কিন্তু মোটেই পরিশ্রম করতে দিত না। ফলে ঘোড়াগুলো মোটাসোটা হয়ে মেদবহুল হয়ে পড়ত। তখন ঘোড়াগুলোকে ঘোড়াশাল থেকে বের করে একদিকে যেমন প্রচুর দৌড়ানো হতো, অন্যদিকে খাবারের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমানো হতো। যেমন ধরুন, প্রথম দিন পরিশ্রম আট ঘণ্টা, খাদ্য তিন কেজি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন পরিশ্রম নয় ঘণ্টা, খাদ্য আড়াই কেজি। এভাবে ধীরে ধীরে পরিশ্রম বেশি কিন্তু খাদ্য কম। কিছুদিন এভাবে ট্রেনিং দেওয়াতে ঘোড়াগুলোর মেদ সব ঢুকত হাড়ের ভেতরে। ফলে ঘোড়াগুলো বাতাসের বেগে দৌড়াতে পারত। অনুরূপভাবে বান্দা ১১ মাস প্রচুর খাওয়ার পরে রমজান মাসে এসে খাবার কম কিন্তু পরিশ্রম তথা ইবাদত-বন্দেগি বেশি করবে। এর ফলে তারা মুত্তাকি হতে পারে।

তাকওয়াকে কুরআন মাজিদে ‘পোশাক’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা আ’রাফের ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ—

‘তাকওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট।’

তাকওয়াকে পোশাক হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণ হলো—পোশাক যেমন ঠান্ডা-গরম, যুদ্ধবিগ্রহ, বিপদ-মুসিবত ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে, তেমনি তাকওয়া যাবতীয় পাপ-পক্ষিলতা থেকে কুলবকে পবিত্র রাখে। পোশাক যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায়, তাকওয়া তেমনি ব্যাস্টিক ও সামগ্রিক সত্তার সৌন্দর্য বাড়ায়।

তাকওয়ার পরিচয়

তাকওয়া শব্দটির সহজ বাংলা পরিভাষা হলো আল্লাহভীতি। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার আজাব ও গজবকে ভয় করে চলার রীতি। এই অনুভূতি যখন কোনো ব্যক্তিকে যেকোনো ধরনের পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখে, তখন বুঝতে হবে—এ ব্যক্তির মাঝে তাকওয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো সরকারি আমলার সামনে বিরাট অঙ্কের একটা ঘুস এলো। মন চাচ্ছে তা গ্রহণ করতে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই দেখছেন এবং তাঁর শাস্তি থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না—এই ভেবে সে ঘুস প্রত্যাখান করল। বুঝতে হবে এই ব্যক্তির মাঝে তাকওয়া আছে। কারও এমন সুযোগ এলো, তিনি সুদের ওপর ঋণ নিয়ে বিরাট বাড়ি বানাতে পারেন। ছেলেমেয়ে, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন সবাই চাপ দিচ্ছে এই সুযোগ হাতছাড়া না করতে। কিন্তু সেই ব্যক্তি আল্লাহ

তায়ালার ভয়ে ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন কারও কাছে নতি স্বীকার না করে অফারটি প্রত্যাখ্যান করল। কারণ, তিনি জানেন—রাসূলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন ‘সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের সাক্ষী, সুদের দলিল লেখকসহ সবাইকে।’^৭ এ অবস্থায় বুঝতে হবে, লোকটির মাঝে তাকওয়া আছে।

হাড় কাঁপানো কনকনে শীতের রাত। ফজরের আজান ভেসে এলো কর্ণকুহরে; অথচ শরয়ি নির্দেশনা মোতাবেক গোসল ফরজ। মন চাচ্ছে আরাম করে ঘুমিয়ে থাকতে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ভয়ে আরামের ঘুমকে হারাম করে বিছানা ছাড়তে হয়। তীব্র শীতকে তোয়াক্কা না করে অজু-গোসল সেয়ে দ্রুত মসজিদে গিয়ে জামাতে শামিল হওয়ার নাম তাকওয়া।

অতএব, তাকওয়া এমন একটা গুণ ও বৈশিষ্ট্যের নাম, যার মাধ্যমে বান্দা সব সময় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে এবং এর ফলে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার পথ সুগম করে নেয়।

তাকওয়া ও রোজার ফায়দা

১. তাকওয়া অর্জনের ফলে মহান স্রষ্টার নৈকট্য হাসিল হয়। সৃষ্টির যা কিছুকে মানুষ ভয় করে, তার সাথে দূরত্ব তৈরি করে। যেমন : ডাকাত, সন্ত্রাসী, মাস্তান, সাপ, বাঘ ইত্যাদিকে মানুষ ভয় করে বলেই দৌড়ে পালায়। পক্ষান্তরে যতই স্রষ্টাকে ভয় করে, ততই স্রষ্টার নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ উন্মোচিত হয়। সৃষ্টিকে ভয় করলে বিচ্ছেদ আর স্রষ্টাকে ভয় করলে আসে মজবুত বন্ধন।
২. তাকওয়া অর্জনের ফলে আত্মশুদ্ধি ঘটে। মানুষের মাঝে রয়েছে পরস্পরবিরোধী দুটি বৈশিষ্ট্য। যথা : ১. প্রবৃত্তি (ইচ্ছে-বাসনা), ২. বিবেক। তাকওয়া প্রবৃত্তিকে বিবেকের ওপর কর্তৃত্ব করতে দেয় না; বরং প্রবৃত্তিকে বিবেকের অধীন করে দেয়।
৩. তাকওয়া এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি। যার হৃদয়ে এ আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তার সফলতা সুনিশ্চিত। এ শক্তি পারমাণবিক বোমার চেয়ে লাখো-কোটি গুণ বেশি। তাকওয়ার শক্তি মানুষকে শুদ্ধ-সুন্দর আর পবিত্র রাখে। যে মানুষ তাকওয়া অর্জন করে, সে কোনো পাপ কাজ করতে পারে না। খুন, সন্ত্রাস, রাহাজানি, অনাচার করে সেই মানুষ, যে তাকওয়া অর্জন করেনি।
৪. মানুষের চাওয়া-পাওয়া, ভোগ-বিলাসের শেষ নেই; অথচ সব সে কখনো পাবেও না। তাই দরকার ধৈর্য ও আত্মসংযম। ভোগের সামগ্রী চোখের সামনে রেখেও ভোগ না করার যে শিক্ষা ও অভ্যাস তথা ধৈর্য গড়ে তোলার জন্য রোজা বেশ কার্যকর।
৫. ক্ষুধা-তৃষ্ণার তীব্রতা রোজাদারকে করে তোলে ত্যাগী ও সহনশীল। জীবনে যেকোনো অবস্থাকেই সহজভাবে গ্রহণ করার মানসিক শক্তি সৃষ্টি হয় রোজার মাধ্যমে। অভাবী, অভুক্ত

ও অনাহারী মানুষের কষ্টানুভব করে তাদের প্রতি দয়া করার মতো ত্যাগী মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষ সুবিবেচক হয়।

৬. সাওমের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ধৈর্য মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে অদম্য সাহস।

৭. রোজাদারকে নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়। পরক্ষণেই মাগরিবের নামাজ। সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার তারাবির দীর্ঘ নামাজের সিডিউল। এর পরই চোখে নামে ঘুমের বন্যা; কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ঘুমানোর সুযোগটুকু নেই। খেতে হয় সেহরি তারপর ফজরের নামাজ পড়তে হয়। এরপর একটু বিশ্রাম নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় রুটি-রুজি তথা প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনে। সব মিলিয়ে মাহে রমজানের বদৌলতে রোজাদার হয়ে উঠে নিয়মানুবর্তী (Punctual) এবং সময় সচেতন (Conscious for time)।

৮. রোজার যাবতীয় হুকুম পালনের মাধ্যমে রোজাদারের মাঝে জাখত হয় সচেতনতাবোধ। অজু করতে গিয়ে অসচেতনভাবে গলায় পানি গেলে রোজা ভঙ্গ হবে। সময় শেষ হওয়ার এক মিনিট পরে সেহরি খেলে অথবা সময় হওয়ার এক মিনিট পূর্বে ইফতার করলে রোজার ক্ষতি হবে। এসব ব্যাপারে সচেতন থাকার ফলে রোজাদারের সৃষ্টি হয় সচেতনতাবোধ।

৯. তাকওয়া অর্জন করলে মৌলিক মানবীয় গুণসমূহ অর্জিত হয়। সাথে সাথে দূরীভূত হয় মৌলিক মানবীয় ত্রুটিসমূহ। যেমন : মিথ্যা, গিবত, রাগ, চোগলখুরি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ, গর্ব-অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মপ্রীতি, আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি। রোজাদার চিন্তা করেন—রোজা রাখার কারণে যেহেতু হালাল জিনিসসমূহ নিষিদ্ধ হয়ে গেল, সেখানে হারাম জিনিস তো আরও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। প্রকৃত রোজাদারের স্মরণে থাকে নবিজির বাণী—

‘যে রোজা রেখে মিথ্যে, গিবত ও ঝগড়াঝাঁটি পরিহার করল না, তার ক্ষুৎপিপাসায় আল্লাহ তায়ালার কিছুই যায় আসে না।’^৮

মোটকথা মাহে রমজানের এই বিস্ময়কর ট্রেনিং বা সাধনা মুমিনদের উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠনে উদ্ভুদ্ধ করে; আর এই তাকওয়াবান মুমিনদের দ্বারাই কেবল সম্ভব সুষ্ঠু, সুন্দর, সুখময় সমাজ গড়ে তোলা।

১০. আমরা সবাই রিজিকের অন্বেষণে পেরেশান থাকি। রিকশাওয়ালাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—রোজা রাখো না কেন? জবাবে বলে—রিজিকের জন্য। অর্থাৎ, রোজা রেখে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রিকশা চালাতে না পারলে রিজিক চলে না। অথচ আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকিদের রিজিকের সংকট দূর করার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন—

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ-

‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য পথ করে দেন এবং তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন এমন স্থান থেকে, যা সে ধারণাও করত না।’^৯

তাইতো আমরা দেখতে পাই, ইউসুফ (আ.) জুলায়খার আশ্রানে সাড়া দিলেন না; বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করলেন। আর এই আল্লাহভীতির কারণেই ইউসুফ (আ.)-কে করে দিলেন ওই দেশের খাদ্যমন্ত্রী আসনে সমাসীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْفَتْحُحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ-

‘যদি কোনো জনপদের অধিবাসীরা তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে, তাহলে অবশ্যই আমি খুলে দেবো তাদের জন্য আসমান ও জমিনের বরকতের দরজাসমূহ।’^{১০}

আক্ষরিকভাবে বাংলাদেশকে গরিব বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ তা নয়। এ দেশে আছে উর্বর ভূমি, বনজ, পানি, মৎস্য, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ। আছে গবাদি পশুর প্রাচুর্য। সর্বোপরি এক সমৃদ্ধশালী জনপদ। যদি এ দেশের সরকার ও জনগণ তাকওয়ার নীতি পুরোপুরি অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তায়ালা হয়তো আসমানের বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দেবেন। অর্থাৎ সময়মতো বৃষ্টি দেবেন এবং অতি বৃষ্টি, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি ইত্যাদি থেকে হেফাজত করবেন। সাথে সাথে জমিনের বরকতের দরজাসমূহও খুলে দেবেন; অর্থাৎ গ্যাসের মতো স্বর্ণ ও তেলের খনি বের করে দেবেন। ইনশাআল্লাহ তখন এ দেশ হয়ে উঠবে বিশ্বের ধনী দেশসমূহের অন্যতম। এ ছাড়াও তাকওয়াবান নাগরিক দুর্নীতিতে লিপ্ত হবে না বলে আমাদের সম্পদসমূহের যথাযথ প্রয়োগ হবে। আর এভাবে আরও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

১১. আল্লাহ তায়ালার কাছে বংশমর্যাদার কোনো দাম নেই, দাম নেই ডিগ্রির, সুস্বাস্থ্য কিংবা ধনসম্পদের; বরং তাঁর কাছে সবচেয়ে দামি হলো তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হলো তাকওয়া—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ-

‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক তাকওয়াবান।’^{১১}

১২. কেবল তাকওয়াবান অর্থাৎ মুত্তাকিনদের আমল আল্লাহ তায়ালার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ইরশাদ হলো—

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ-

‘আল্লাহ তায়ালা কেবল মুত্তাকিনদের (আমল) কবুল করেন।’^{১২}

^৯ সূরা তালাক : ২

^{১০} সূরা আ’রাফ : ৯৬

^{১১} সূরা হুজুরাত : ১৩

^{১২} সূরা মায়েদা : ২৭

১৩. আল্লাহ তায়ালা ওলি হতে হলে দরকার তাকওয়া অর্জন। ইরশাদ হলো—

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ-

‘জেনে রেখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ওলিদের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তিতও হবে না—যারা ঈমান আনে আর তাকওয়া অবলম্বন করে।’^{১৩}

কেউ যদি সঠিকভাবে রমজানের রোজাসমূহ পালন করেন এবং এর মর্যাদা রক্ষা করেন, তাহলে সে অবশ্যই তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর ওলি হয়ে যাবেন। রমজানের রোজা তাকওয়াবান হওয়ার জন্য তথা আল্লাহর ওলি হওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটের ন্যায় কাজ করে। প্রশ্ন জাগে, কীভাবে সম্ভব? চলুন দেখি—

১ দিন = ১২ ঘণ্টা

সুতরাং মাহে রমজানের ৩০ দিন = ১২ × ৩০ = ৩৬০ ঘণ্টা

সৌর বৎসর অনুযায়ী ৩৬৫/৩৬৬ দিনে ১ বছর

চান্দ্র ” ” ৩৫৪ দিনে ১ বছর।

এ দুটোর মাঝামাঝি ধরে নিলাম ৩৬০ দিনে ১ বছর।

তাহলে রমজানের ৩৬০ ঘণ্টা হলো বছরের ৩৬০ দিনের জন্য

সুতরাং ” ১ ” ” ” ১ দিনের জন্য

অর্থাৎ, মাহে রমজানের এক ঘণ্টা যেন ওই বছরের এক দিনের জন্য একটি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেটের ন্যায় কাজ করে—যদি সত্যিকার অর্থেই রোজা রাখা যায়, তখন বাস্তবেই প্রতিটি রোজাদার ‘মুক্তাকি’ হয়ে যাবে। এক মাস রোজা রাখার কারণে সারা বছর তাকওয়ার ওপর চলা সহজ হবে।

১৪. তাকওয়াবানরাই শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হয়। ইরশাদ হলো—

وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا-

‘যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও (অর্থাৎ দৃঢ় পদক্ষেপ অবলম্বন করো) এবং মুত্তাকি হও, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।’^{১৪}

তাহলে বলা যায়, মুসলিমগণ যদি সবার ও তাকওয়ার ওপর অটল থাকত, তাহলে বিশ্বের কোনো শক্তিই তাদের পদানত করতে পারত না।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এক সাহাবি গাধার পিঠে বসে বল্লম হাতে ইরানের সিপাহসালার রুস্তমের দরবারে উপস্থিত হন। রুস্তমের দরবারে বিছানো অতি মূল্যবান গালিচার ওপর বল্লম গোড়ে তার চোখে চোখ রেখে তিনি কথা বলেন নিষ্ঠুরভাবে। বৈষয়িক শক্তি ও দাপটের

^{১৩} সূরা ইউনুস : ৬২-৬৩

^{১৪} সূরা আলে ইমরান : ১২০

তোয়াক্কা না করে রুস্তম ও তার সভাসদগণের সামনে তিনি তুলে ধরেন ইসলামের সুমহান বাণী। তাকওয়া'র শক্তিই তাঁকে এত নিভীক ও দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন করে গড়ে তুলেছিল। মোটকথা সবর ও তাকওয়াই ছিল এককালে মুসলমানদের সাফল্যের চাবিকাঠি।

১৫. আখিরাতে'র সবচেয়ে উত্তম সম্বল হলো তাকওয়া। ইরশাদ হলো—

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ-

‘(হে আখিরাতে'র পথের পথিক) তোমরা পথের সম্বল সংগ্রহ করো। কারণ, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম পথের সম্বল হলো তাকওয়া। এবং আমাকে ভয় করো হে জ্ঞানীগণ।’^{১৫}

কেউ যদি প্রবাসে বা সফরে রওয়ানা করে, তবে বহু আগে থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হয়। পাসপোর্ট, ভিসা, ডাক্তারি সার্টিফিকেটসহ প্রয়োজনীয় সামগ্রী ঠিকঠাক করে নিতে হয়। এসব নেওয়ার ব্যাপারেও থাকতে হয় সতর্ক। তেমনি কবর ও হাশরের সফরের জন্যও প্রস্তুতি নিতে হয়। প্রস্তুতি মানে তাকওয়া অর্জন করা। আর তাকওয়া'র পেছনে আসে বিশুদ্ধ নিয়তের নেক আমল। এই তাকওয়াই হলো কবর-হাশরের তথা আখিরাতে'র সবচেয়ে উত্তম ও একমাত্র সম্বল।

রোজার ফজিলত, মাহাত্ম্য ও সওয়াব সম্পর্কে

ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ। তবুও ইসলাম শান্তির ধর্ম। কীভাবে শান্তির ধর্ম হলো?

ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি; কালিমা থেকে বিশ্বাস, নামাজ থেকে অশ্লীলতা বন্ধ এবং শৃঙ্খলাবোধ ও আমিরের আনুগত্য, জাকাত থেকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, হজ থেকে ভ্রাতৃত্ব আর রোজা থেকে বাস্তব সহানুভূতি ও সমবেদনার শিক্ষা পাই। এ বিষয়গুলোই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের নিশ্চয়তা প্রদানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনে রোজার ভূমিকা অবিস্মরণীয় ও ফলপ্রসূ।

হাশরের মাঠে রোজা ও কুরআনের সুপারিশ

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘রোজা ও কুরআন উভয়েই বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোজা আরজ করবে—“হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলা খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত রেখেছি, আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন।” কুরআন মাজিদ বলবে—“হে আল্লাহ! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ কবুল করুন।” সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।’^{১৬}

^{১৫} সূরা বাকারা : ১৯৭

^{১৬} মুসনাদে আহমাদ : ৬৬২৬

ধরে নিন, আপনি বেনাপোল সীমান্তে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়েছেন। BSF-এর সদস্যরা আপনাকে ধরে নিয়ে গেছে। এখনই আপনাকে রিমান্ডে নেবে। আপনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন। কাজেই আপনার দুঃখের অন্ত নেই। হঠাৎ এক অফিসার যদি আপনার জন্য সুপারিশ করে এই বলে—‘এই লোককে ধরে নিয়ে এসছ কেন? সে আমার খুবই পরিচিত, খুবই ভালো লোক। তাকে ছেড়ে দাও,’ তখন আপনার কেমন লাগবে? আপনার আনন্দের আর সীমা থাকবে না। তেমনি কঠিন হাশরের ময়দানে ফেরেশতাগণ যখন আমাদের দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেবে, তখন রোজা ও কুরআন যদি সুপারিশের জন্য এগিয়ে আসে, তখন আমাদের সৌভাগ্যের সীমা থাকবে না।

রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ দেবেন

ফসল ওঠানোর যেমন একটা মৌসুম থাকে, তেমনি যেকোনো ব্যবসায়ের একটা মৌসুম থাকে। যেমন : পোশাক ব্যবসায়ীরা সারা বছর যা বিক্রি না করে, শুধু দুই ঈদেই তার চেয়ে বেশি বিক্রি করেন। ব্যবসায়ীদের যেমন মৌসুম থাকে, তেমনি ইবাদতেরও মৌসুম রয়েছে। আর সেটি হলো ‘মাহে রমজান’। কারণ হলো—রমজানে একটি নফল অন্য মাসের একটি ফরজ সমতুল্য এবং রমজানে একটি ফরজ অন্য মাসের ৭০টি ফরজের সমতুল্য। হাদিসে আছে—

‘যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটি পুণ্যের (নফল) কাজ করল, সে যেন রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে ৭০টি ফরজ পালন করেছে। আর যে ব্যক্তি রমজান মাসে একটি ফরজ আদায় করল, সে যেন রমজান ছাড়া অন্য সময়ে ৭০টি ফরজ আদায় করল।’^{১৭}

নিচের ছকে বিষয়টি দেখা যাক—

অক্ষর-সংখ্যা	অজু ছাড়া পড়লে ১০ নেকি	অজুসহ পড়লে ১০০ গুণ	রমজানে পড়লে আরও ৭০ গুণ
বিসমিল্লাহ ১৯টি অক্ষর	$19 \times 10 = 190$	$19 \times 100 = 1900$	$1900 \times 70 = 133000$
সুবহানাল্লাহ (৮টি অক্ষর)	$8 \times 10 = 80$	$8 \times 100 = 800$	$800 \times 70 = 56000$

^{১৭} সহিহ ইবনে খুজাইমা : ১৮৮৭

আলহামদুলিল্লাহ (৯টি অক্ষর)	$৯ \times ১০ = ৯০$	$৯ \times ১০০ = ৯০০$	$৯০০ \times ৭০ = ৬৩০০০$
আল্লাহ আকবার	$৮ \times ১০ = ৮০$	$৮ \times ১০০ = ৮০০$	$৮০০ \times ৭০ = ৫৬০০০$
সূরা ইখলাস (৪৭টি অক্ষর)	$৪৭ \times ১০ = ৪৭০$	$৪৭ \times ১০০ = ৪৭০০$	$৪৭০০ \times ৭০ = ৩২৯০০$

হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার ভালো কাজের নেকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারেন।

তবে মনে রাখা দরকার, আসল ইবাদত না করলে নফল বা অতিরিক্ত ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায় না। ধরুন, আপনি বাজারে গিয়ে ছোটো ছোটো মাছ প্রচুর কিনলেন। বিক্রেতা আপনার ব্যাগে মাছগুলো ঢেলে দিলো। দেওয়ার পর কিছু ‘ফাও’ (অতিরিক্ত) দিলো। ফাও (অতিরিক্ত) মাছগুলো পেয়ে আপনি যদি বলেন—‘ভাই, টাকার বিনিময়ে যে মাছগুলো দিয়েছ, সেগুলো ফিরিয়ে নাও, আর আমার টাকাটা ফেরত দাও। কারণ, ফাও (অতিরিক্ত) যা দিয়েছ, তাতেই আমার চলবে।’ আপনার এ কথা শুনে বিক্রেতা রাগান্বিত হবে এবং হয়তো বলেই ফেলবে—‘যে টাকা দিয়ে কিনে নেয়, তাকেই ফাও দেওয়া হয়। যে আমার জিনিস কিনল না, তাকে ফাও দেবো কীভাবে?’ ঠিক তেমনি ফরজ ইবাদত তথা মূল ইবাদত যেমন : নামাজ-রোজাই যে করছে না, তাকে রোজার বোনাস দেওয়া হবে কীভাবে?

আর রোজার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দেবেন। এক হাদিসে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেছেন—

‘বনি আদমের প্রত্যেক আমলের সওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ বলেন, তবে রোজার সওয়াবের কোনো পরিমাণ নেই। কারণ, রোজা কেবল আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো। বান্দা একমাত্র আমার জন্যই স্বীসহবাস ও খাবার পরিত্যাগ করেছে।’

আল্লাহ তায়ালা রোজাদারদের পানি পান করাবেন

একটি হাদিসে এসেছে—

‘আল্লাহ তায়ালা নিজের ওপর ফয়সালা করেছেন—যে ব্যক্তি গরমের দিন রোজা রাখে, আল্লাহ তাকে পিপাসার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পানি পান করাবেন।’^{১৮}

রোজা জান্নাত লাভের পথ

আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

‘আমি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বললাম—“আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।” তিনি বললেন—“তুমি রোজা রাখো। কারণ, রোজার বরাবর কোনো আমল নেই।” আমি দ্বিতীয়বার এসে একই প্রশ্ন করলে আবারও রোজার কথা বললেন।”^{১৯}

রোজাদারের দুআ কবুল হয়

আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

‘রোজাদার যখন ইফতারের সময় দুআ করে, তখন তার দুআ প্রত্যাখ্যান করা হয় না (অর্থাৎ তার দুআ কবুল হয়)।’^{২০}

অপর এক হাদিসের বর্ণনায় রোজার ইফতার সময়কে দুআ কবুল উপযুক্ত বলা হয়েছে। হাদিসটি এমন—

‘ইফতারের সময় রোজাদারের দুআ কবুল হয়।’^{২১}

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে বর্ণিত আরেক হাদিসে আছে—

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন—‘তিন ব্যক্তির দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না—ন্যায়পরায়ণ বাদশা, ইফতারের পূর্ব পর্যন্ত রোজাদার এবং মজলুমের দুআ।’^{২২}

পেছনের সকল গুনাহ মাফ

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

‘যে ব্যক্তি রমজানের রোজার হক ও আদব রক্ষা করে যথাযথভাবে রোজা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন।’^{২৩}

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন—

‘যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের নিয়তে রমজানের রোজা রাখে, তার অতীতের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’^{২৪}

^{১৯} সুনানে নাসায়ি : ২২২৩

^{২০} মুজাম্মুল কাবির : ১৪৩৪৩

^{২১} শুআবুল ইমান : ৩৩০৮

^{২২} ইবনে মাজাহ : ১৭৫২

^{২৩} মুসনাদে আহমাদ : ১৫৫২৪

^{২৪} বুখারি : ৩৮

উম্মতে মুহাম্মাদির বিশেষ বৈশিষ্ট্য

আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

‘রমজান বিষয়ে আমার উম্মতকে পাঁচটি জিনিস বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি—

১. রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক আম্বরের চেয়ে বেশি প্রিয়।
২. ইফতার পর্যন্ত তাদের ক্ষমার জন্য সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত দুআ করে।
৩. আল্লাহ তায়ালা রমজানের প্রতিদিন তাঁর জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন আর বলেন—“শীঘ্রই আমার প্রিয় বান্দাগণ দুনিয়ার কষ্ট ফেলে তোমার ভেতর প্রবেশ করবে।”
৪. অভিশপ্ত শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখেন। তাই সে রমজান মাসে কুমন্ত্রণা দিতে পারে না, যা আগে দিয়ে থাকত।
৫. আর রমজানের শেষ রাতে তাদের জন্য ক্ষমার ফয়সালা করা হয়। রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—“সেটা কি শবেকদর?” তিনি বললেন—“না। নিয়ম হলো, ‘কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেক শ্রমিকের পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।”^{২৫}

রমজানে যারা বদদুআ পায়

কাব ইবনে উজরা (রা.) হতে বর্ণিত—‘রাসূল (সা.) সবাইকে মিস্বারের কাছে গিয়ে বসতে বললেন। আমরা গিয়ে বসলাম। তিনি প্রথম সিঁড়িতে ওঠার পর বললেন—“আমিন।” দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন— “আমিন।” অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে ওঠার পর বললেন—“আমিন।” রাসূল (সা.) মিস্বার হতে অবতরণের পর আমরা বললাম—“আজকে আমরা আপনাকে এমন জিনিস বলতে শুনলাম, যা আগে কখনো শুনিনি।” রাসূল (সা.) বললেন—“জিবরাইল (আ.) আমার কাছে আসার পর বলল—“ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে রমজান পাওয়ার পরও তার গুনাহ মাফ হয়নি। তখন আমি বললাম— আমিন। আমি দ্বিতীয় সিঁড়িতে ওঠার পর সে বলল—ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার কাছে আপনার কথা আলোচনা হওয়ার পরও দরুদ পড়ে না। তখন আমি বললাম—আমিন। আমি তৃতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করার পর সে বলল—ধ্বংস হোক ওই ব্যক্তি, যে তার পিতা-মাতাকে বা একজনকে পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না। আমি বললাম—আমিন।”^{২৬}

হাদিসে নববিতে রমজানের সারগর্ভ

নিচের হাদিসের মধ্যে রমজান বিষয়ে বেশ কিছু ফজিলত ও গুরুত্বের কথা বিবৃত হয়েছে—

^{২৫} মুসনাদে আহমাদ : ৭৯৭১

^{২৬} আল মুজামুল কাবির : ৩১৫

সালমান ফারসি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—‘রাসূল (সা.) শাবানের শেষ দিন আমাদের একটি ভাষণে তিনি বলেন—“হে লোকসকল! তোমাদের কাছে একটি মহান ও বরকতময় মাস আগমন করছে। এই মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার রাতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এ মাসের রোজাকে আল্লাহ ফরজ করেছেন আর রাতে নামাজ পড়াকে করেছেন নফল। কেউ এ মাসে একটি নফল আদায় করলে অন্য সময়ের ফরজ আদায়ের সওয়াব পাবে। আর একটি ফরজ আদায় করলে অন্য সময়ের ৭০টি ফরজ আদায়ের সমান হবে। এ মাস ধৈর্যের মাস আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো জান্নাত। এটা সমবেদনার মাস। এ মাসে মুমিনের রিজিক বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করায়, তাহলে তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, সে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব তাকেও দেওয়া হবে।” আমরা বললাম—“হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সবাই তো রোজাদারকে ইফতার করানোর সামর্থ্য রাখে না।” তখন রাসূল (সা.) বললেন—“কেউ এক টোক দুধ, একটি খেজুর অথবা শুধু পানি দ্বারা ইফতার করলেও আল্লাহ তাকে এই পরিমাণ সওয়াব দেবেন। আর কেউ যদি রোজাদারকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ায়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে হাউজে কাওসার হতে পান করাবেন আর সে জান্নাতে প্রবেশ করার আগে পিপাসার্ত হবে না। এই মাসের প্রথমাত্ংশ রহমত, দ্বিতীয়াংশ মাগফিরাত আর শেষাত্ংশ জাহান্নাম হতে মুক্তির। যে ব্যক্তি এ মাসে তার কর্মচারীদের ওপর দয়া করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দেবেন।”^{২৭}